Android Coding Bd

পঞ্চম অধ্যায়

সামরিক শাসন : আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের শাসনামল ১৯৫৮-১৯৭১

১৯৪৭ সালের পর উপমাহাদেশে সামরিক শাসন জারি হবে তা কেউ কখনও ভাবেন নি। সামরিক শাসনের অর্থ হলো, বেসামরিক কর্তৃত্ব বিলোপ। সভ্যদেশসমূহকে বেসামরিক কর্তৃত্বের অধীনে সবাইকে কাজ করতে হয়। এমনিক সামরিক বাহিনীকেও।

সামরিক শাসন জারি হলে তা থাকে না। তারা সংবিধান বিলোপ করে, বেসামরিক কর্তৃত্বকে অধীনস্থ করে, রাজনীতিবিদদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে। সামরিক শাসনামলে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরই সমস্ত জাগতিক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন আইয়ুব খান। তার পতন হলে নতুন সামরিক শাসক হন ইয়াহিয়া খান।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করেন, 'রাজনীতিকদের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দেবার দায়িত্বটা সামরিক বাহিনীরই।' যে ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানকে ক্ষমতায় এনেছিলেন, সেই আইয়ুবই ক্ষমতা দখল করে ঘোষণা করেছিলেন, 'মির্জা নির্বোধের মতো আচরণ করলে, যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে' তিনি তার গুরুদায়িত্ব পালন করবেন। আইয়ুব নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ১৩ জন জেনারেলকে বরখাস্ত করেছিলেন, রাজধানী করাচী থেকে প্রথমে রাওয়ালপিন্ডি পরে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেছিলেন, নিজেকে ফিল্ড মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সামরিক শাসনের প্রকৃতির জন্য একে সাধারত: জংলি আইন বলে উল্লেখ করা হয়। এক কথায় সামরিক শাসন হলো প্রচলিত আইন বিরোধী, দায়-দায়িত্বহীন, উৎপীড়নমূলক শাসন যেখানে অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি রাখা হয়। আগে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজ স্বার্থে সামরিক শাসকদের সমর্থন করতো। আজকের পরিবর্তিত পৃথিবীতে সামরিক শাসকরা আর সে রকম পৃষ্ঠপোষকতা পান না।

খ. আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও শাসনের বৈশিষ্ট্য

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নূন সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি উক্ত ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুবখানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। একই ফরমান বলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করা হয়, জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক

Android Coding Bd

দলসমূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হয়। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়। এইভাবে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের পর আইয়ুব খানের জন্য ২টি কাজ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রথমত তাকে এটা প্রমাণ করা যে, পূর্ববর্তী শাসনাকালে দেশ ধ্বংসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এটা প্রমাণ করা যে, তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশকে কেবল ধ্বংসের হাত থেকেই রক্ষা করেননি, বরং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করেছেন।

আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্য বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদগণের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থান্ধতা দুর্নীতি, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, দেশপ্রেমের প্রভাব প্রভৃতি কারণে তারা দেশের জন্য গঠনমূলক কিছু করতে পারেননি। তাছাড়া গুপ্তচালান, মজুদদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সামরিক সরকার যেভাবে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ধনী ব্যবসায়ী প্রমুখের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে তাতে তাদের দুর্নীতির বিষয়টি জনগণের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রথম যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং ফিরোজ খান নূন। অনেক সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। এমনকি এম. এ. খুহরো নামক একজন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে কালোবাজরে গাড়ি বিক্রির দায়ে আটক করা হয়। এভাবে জনমনে একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে সামরিক সরকার দেশ থেকে দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করতে বদ্ধপরিকর।

সামরিক আইন জারি কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তদন্ত করে দেকা যায় (দুর্নীতিপরায়ণ) রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ ১৯৫৯ (Elective Bodies Disqualification Order 1959) সংক্ষেপে (BDO এবং PODO (Public Office Disqualification Order)-(সরকারি পদ লাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশ বলে সামরিক সরকার দেশের যে কোনো সরকারি পদে আসীন ছিলেন এবং যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য ছিলেন এমন ব্যক্তিগণকে 'অসদাচরণের' দায়ে অভিযুক্ত করতে পারতেন। উক্ত

Android Coding Bd

আদেশে 'অসদাচরণ' বলতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন ও দুর্নীতি করাকে বুঝানো হয়। কারো বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপন করা হলে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও শুনানি গ্রহণের জন্য দুই প্রদেশে দুইটি ও কেন্দ্রে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এইরূপে ট্রাইবুনালে কেউ অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদণ্ডে ও দণ্ডিত হতেন। এবডো-র আওতায় সামরিক সরকার ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম।

কেবল রাজনীতিবিদদেরকেই আইয়ুব খান হেয় প্রতিপন্ন করেননি, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্যকেও তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ণয় করার জন্য সামরিক সরকার চারটি ট্রেনিং কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের মোট ১৬৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান কাণ্ড হয়। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জেল-জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকারের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা যে-সকল পত্রিকায় প্রকাশ পেত-যেমন ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজার্ভার–সেগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করে সরকারি ও আধা-সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়। সামরিক শাসন বিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমনে বাধা দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় লিখেছেন:

> সামরিক শাসন প্রথমেই আঘাত হেনেছে সংবাদপত্রের উপর। বাঙালিরা দেখলো, দেখে মর্মাহত হলো যে, সাংবাদিকরা সামরিক শাসন বিরোধী উচ্চারণ বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে কথা বলতে গিয়ে কিভাবে বন্দী হচ্ছেন, দমিত হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় রীট জারি করে সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য বিচার বিভাগও এগিয়ে আসেনি।

আইয়ুব খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র মতো বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যুক্তি দেন যে, দুই অঞ্চলের সংহতি বিধানের জন্য এক ভাষা দরকার। সেজন্য তিনি ভাষার সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যে রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ বাংলা একাডেমীকে এই সস্কার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান-এর সভাপতিত্বে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রতিবাদলিপি ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাকে* ফেব্রুয়ারি ১৯ ও ২০ (১৯৫৯) তারিখ 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শিরোনামে দুটো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকাতেও প্রতিবাদ ছাপা হয় (চৈত্র ১৩৬৫, পৃ-৫০১)। ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন।

Android Coding Bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগও রোমান হরফের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এইসব প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খানের বাংলা হরফ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তানী দালাল-রা বাঙালি হয়েও বাংলার স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকেন। তারা বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে 'মুসলমানিত্ব প্রদানের' উদ্যোগ নেন। তাদের চেষ্টায় নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন এবং জয়ন্ত কুমার রায় লিখেছেন।

> কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'-এর একটি লাইনে ছিল
> 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান, পাঠ্য বইয়ের তা সংশোধন করে লেখা হল সজীব করিব গোরস্থান। প্রচলিত কবিতা-সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' এর সংশোধন করা হলো এভাবে 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'

আইয়ুব খান এবং তার অনুসারীরা রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন। তারা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করতেন। ১৯৬১ সাল ছিল বিশ্ব কবির জন্মশত বার্ষিকী। এ উপলক্ষে যেন কোনো অনুষ্ঠান না হয় সরকার সেই চেষ্টা চালায়। বাংলা একাডেমী যেন রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন না করে। সরকার সে ব্যবস্থা করে এবং সফল হয়। সাংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার কে. জি মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। তবে সরকার ও তার অনুচরবৃন্দের শতচেষ্টা সত্ত্বেও সকল সাংস্কৃতিকর্মীকে আটকিয়ে রাখা যায়নি। বিচারপতি মাহবুব মোরশিদের এবং অধ্যাপক খান সরওয়ার মোর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটি'। এই কমিটি ছয়দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডাকসু কার্জন হলে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ওয়াহিদুল হক ও সনজীদা খাতুন এবং আরো অনেকে মিলে গঠন করেন 'ছায়ানট'। মফস্বল শহরেও রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অত্যন্ত জাকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'-এর ব্যবস্থা করা। নিচের দিক থেকে এই স্তরগুলি ছিল : (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) বা তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল: কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত। ১০,০০০

Android Coding Bd

থেকে ১৫,০০০ সংখ্যক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বনিম্ন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ১৫ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত। তার মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১২০০ থেকে ১৫০০ জন ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দই মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democracy Member) বা সংক্ষেপে B.D. Member নামে পরিচিত হন। উভয় দেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী Electoral College হিসেবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৩ ভাগের ১ ভাগ সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত। তবে এই মনোনয়নের বিধান ১৯৬২ সালের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় বিলুপ্ত হয়। নির্বাচিত অধিক গণতন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ইউনিয়নের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ছাত্র-পুলিশের সহায়তায় তা ইউনিয়নে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ Conciliation Court- এর মাধ্যমে ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তির অধিকারী হয়। নিজস্ব কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য এটা জনসাধারণের ওপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপেরও তা আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে।

২. থানা কাউন্সিল : ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরবর্তী ধাপ ছিল থানা কাউন্সিল। থানার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন কাউন্সিলের (পশ্চিম পাকিস্তানে তহশিল কাউন্সিল) চেয়ারম্যানবৃন্দ ও সমসংখ্যক থানা/তহশিল পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে থানা/তহশিল কাউন্সিল গঠিত হয়। মহকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। থানার সার্কেল অফিসার পদাধিকার বলে থানা কাউন্সিলের সভাপতি হন। তিনি মহকুমার প্রশাসকের অনুপস্থিতিতে থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন করাই ছিল থানা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

৩. জেলা কাউন্সিল : থানা কাউন্সিলের উপরে ছিল জেলা কাউন্সিল। এর জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৪০। তার অর্ধেক সদস্য ছিল জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বাকি অর্ধেক ছিলেন বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধেক জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে মনোনীত করতেন। ডেপুটি কমিশনার জেলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। জেলা কাউন্সিলের বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক– এই দুই ধরনের দায়িত্ব ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র অর্ডার-এর চতুর্থ তফশিলের প্রথম অংশে বাধ্যতামূলক কার্য এবং ২য় অংশে

Android Coding Bd

ঐচ্ছিক কার্যাবলির বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪. **বিভাগীয় কাউন্সিল :** বিভাগীয় কাউন্সিল মৌলিক গণতন্ত্র কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপ। এর মোট সদস্যসংখ্যা ৪৫ জন। মোট সদস্যের অর্ধেক ছিলেন সরকারি সদস্য। বিভাগের অন্তর্গত জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ ছিলেন সরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যের অন্তত অর্ধেক বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে থেকে মনোনীত। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলা কাউন্সিলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

পর্যালোচনা

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা আইয়ুব খানের অভিনব সৃষ্টি। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এমন এক গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলা হয় যা জনগণ বুঝতে পারবে: কিন্তু বাস্তবে আইয়ুবের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা। আইয়ুব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা গ্রাম এলাকায় নতুন রাজনীতিক হিসেব গড়ে উঠে আইয়ুবের স্বার্থরক্ষা করবেন। তারা সরকারের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার বিনিময়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের ক্যাডারে পরিণত হবেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটাধিকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দেওয়া হয়। ফলে জনগণ সেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে জাতীয় রাজনীতিতে দেশের জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। সীমিত সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে নির্বাচনে সরকারি প্রার্থীর জয়লাভ সহজ হয়। আইয়ুব খান নিজেও ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেবল মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে বশীভূত করে ভোট আদায় করে জয়লাভ করেন–যদিও উক্ত নির্বাচনে সাধারণ জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সমর্থন ছিল সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে।

বিভিন্ন নির্বাচন

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যগণকে অর্থাৎ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B.D Member) নির্বাচিত করেন। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৩ জানুয়ারি (১৯৬০) The Presidential (Election and Constitutional) Order, 1960 গঠন করেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি রেফারেন্সের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট পদে

Android Coding Bd

নির্বাচিত করে তাকে একটি সংবিধান প্রণয়ন অধিকার প্রদান করবে। তিনি যে পদে তার মেয়াদকাল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে প্রণীত সংবিধানে যে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হবে– সেই প্রথম মেয়াদকালের জন্য। এইভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭৮,৭২০টি ভোট পড়ে, তন্মধ্যে হ্যাঁ-ভোট ২৫,২৮২টি ছিল। ১৯৬০ সালে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।

গ. আইয়ুব খানের পতনও ইয়াহিয়া খানের শাসন, এক ইউনিট বিলুপ্তিকরণ, সার্বজনীন ভোটাদিকার, এলএফও

সামরিক শাসনামল

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারি করার মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রদেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তার সামরিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীকরণ। তিনি নিজের হাতে সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এমনকি প্রাদেশিক সরকারের উপরও তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকে। দেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। দুর্নীতি দমনের নামে দেশের অনেক জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার উপর উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আইয়ুব খান নিজস্ব অনুগত বাহিনী গঠন করেন– যা দেশের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। তার ভূমি-সংস্কার কাগজে-কলমেই থেকে যায়–তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র মুসলিম পারিবারিক আইন ছিল একটা ইতিবাচক দিক।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, কিংবা কোনো বক্তব্য-বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কিছু রাজনীতিবিদ নানান কৌশলে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সামরিক শাসনের সময়ে আইয়ুব বিরোধী নীরব আন্দোলনের ইস্যু ও আন্দোলনের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল :

১৯৬২-র ছাত্র-আন্দোলন

১৯৬১ সালের শেষের দিকে মুজিব ও মানিক মিয়া এবং মণি সিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন

Android Coding Bd

যৌথভাবে কাজ করবে।'

সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদ

এই বৈঠকের পরপরই ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ছাত্রধর্মঘট আহবান করে। রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ধর্মঘট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ এবং অনেক ছাত্রনেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

সংবিধান বিরোধী আন্দোলন

সামরিক আইন চলাকালীন সময়েই ছাত্ররা আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ১ মার্চ (১৯৬২) পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করা হয় (এবং তা কার্যকরী করা হয় ৮ জুন থেকে)। উক্ত সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানীদের 'দাবি-দাওয়া' চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, ভোটাধিকার সংরক্ষিত করে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে একটি শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়–যারা শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহকহিসেবে কাজ করবে। উক্ত সংবিধান (যা ব্যক্তি আইয়ুব খান দ্বারা নিজের স্বার্থে প্রণীত) ঘোষিত হওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। সরকারও প্রচণ্ড ছাত্র-দলন শুরু করেন। বহু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের ব্যাপক হারে গ্রেফতারের আরেকটি কারণ ছিল। ইতোমধ্যে নতুন সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছিল। ছাত্ররা উক্ত নির্বাচন বয়কটের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহবান জানায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের নির্বাচন বয়কটের আহবানে সাড়া না দিলেও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা (হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক, মোহসেন উদ্দিন আহমেদ) গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেন। সে দাবিতেও সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং ৮ জুন (১৯৬২) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আরেকটি আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। তা ইতিহাসে 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে অভিহিত হয়ে আছে। আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে যে চমক দেখান, শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা তার একটি। তিনি ১৯৫৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শিক্ষা কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। সরকারিভাবে উক্ত কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮)। তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে সভাপতি করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা

Android Coding Bd

কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের নাম শরীফ কমিশন। ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট কমিশন তার সুপারিশ পেশ করে। রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল:

তিন বছরের বি.এ. পাস কোর্স পদ্ধতি চালু করা। (এর আগে দুই বছরের বি. এ পাস কোর্স চালু ছিল)।

স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা, শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং বাকি ২০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করা।

৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা।

এই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। তারা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই ফোরামের ব্যনারে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজেও (জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ, ইডেন কলেজ) প্রতিবাদ সভা করে। শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরামে' রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে।

মুনতাসীর মামুন এবং জয়ন্ত কুমার রায় আন্দোলনের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন:

১৫ ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন মিছিল-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই আগস্ট পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্ররা আহবান করে হরতাল..... ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্র-জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাবুল, বাসকন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ.... আহত হয় প্রায় আড়াইশো জন। যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা শহরেও ব্যাপক প্রতিরোধ হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর নিহত হয় একজন ছাত্র।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সারা দেননি। তখনো প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল—এটাও সমর্থন না-দেয়ার একটা কারণ হতে পারে। বাষট্টির সেপ্টেম্বরে এই আন্দোলনের সাফল্য এই যে, সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রাখেন। এই আন্দোলনের বড় সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'রূপে পালিত হত এবং আজো ছাত্রসমাজ এ দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করে।

৬৪-র ছাত্র আন্দোলন

ঘ. ১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ : ছাত্রদের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, ১৯৬২ সালে ছাত্ররা তিনটি ইস্যুতে তিনবার আন্দোলনে নামে: প্রথমত, সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, দ্বিতীয়বার সংবিধান বিরোধী আন্দোলনে মার্চ মাসে এবং তৃতীয়বার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আগস্ট-সেপ্টেম্বর। এরপর ১৯৬৪ সালে একের পর এক অনেকগুলো আন্দোলন হয়। চৌষট্টির প্রথম আন্দোলন ছিল অবাঙালি সাম্প্রদায়িক

Android Coding Bd

দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের [illegible] অবাঙালি মুসলমানেরা ঢাকা শহরে এবং তারপর আশেপাশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ফেব্রুয়ারির এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গায় মিলিত হয়। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের রক্ষা করতে যেয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং ১৬ জানুয়ারি ঢাকায় নটরডেম কলেজের ক্যাথলিক ফাদার নোভাক নিহত হন। মোহাম্মদপুরের বিহারিরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মেয়েদের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়। ইত্তেফাক-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নেতৃত্বে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয় এবং কমিটির উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি তারিখে ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদ পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়।

ঢাকার সচেতন ছাত্রসমাজ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

২. সমাবর্তন বিরোধী আন্দোলন : চৌষট্টিতে ছাত্রদের আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বাষট্টি সালেই মোনেম খান ছাত্রসমাজের বিরূপতা অর্জন করেন। ঐ বছর তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ময়মনসিংহ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি দেশের রাজবন্দিদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদেরকে যেন মুক্তি দেয়া না হয় তার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। এতে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়। জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে-- পাকিস্তানে যাওয়ার পথে তেজগাঁও বন্দরে ছাত্ররা তাকে লাঞ্ছিত করে। এতে তিনি আইয়ুব খান কর্তৃক পুরস্কৃত হন। তিনি আইয়ুব মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হয়। এর অল্প দিন পরেই আইয়ুব খান তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নর হিসেবে মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন স্টিমরোলার চালানোর জন্য আইয়ুবের একজন বিশ্বস্ত, অনুগত ও প্রভুভক্ত চাকরের দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হয়েই তিনি ছাত্রদের দমনের কাজ শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য ড. এম.ও. গণিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। ছাত্রদেরকে দমনের জন্য এন.এস.এফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এন এসএফ এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর মোনেম খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। স্বভাবতই তিনি ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এই মোনেম খান যখন সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে ছাত্রদেরকে ডিগ্রি প্রদান করতে যান তখন ছাত্ররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাবর্তন উৎসব প্রথম ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ মার্চ ১৯৬৫ তারিখে। এরপর ২২ মার্চ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তারিখ। রাজশাহী

Android Coding Bd

উৎসব প্যান্ডেলে ছাত্ররা কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং [illegible] মোনেম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। ঢাকার সমাবর্তনের দিন মোনেমে খান সমাবর্তন প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র ছাত্ররা আইয়ুব মোনেমে বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্র-পুলিশ খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। সমাবর্তন উৎসব হল লণ্ড ভণ্ড। এর পরিণতিতে এল পুলিশ ও এনএসএফের সম্মিলিত ছাত্র নির্যাতন। 'ডিগ্রি প্রত্যাহার, বহিষ্কার, গ্রেফতার, হুলিয়াজারি এসব মিলিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য চলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৪শত স্কুল ও ৭৪টি কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয় এর ১২শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

রাশেদ খান মেনন এই আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> এই আন্দোলনে আশু কোনো ফল লাভ না হলেও এই প্রক্রিয়া ছাত্র-আন্দোলনকে অনেকখানি বহির্মুখী করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-আন্দোলনের চাপ আরও তীব্র হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আইয়ুব-মোনেমী এই তাণ্ডব নৃত্য সামাজিক অন্যান্য শক্তিকেও দ্রুত ঐ একনায়কতন্ত্রমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পোলারাইজড হতে সাহায্য করে। এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই চৌষট্টির শেষের দিকে জন্ম নেয় সম্মিলিত বিরোধী দল ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন আরো বিশদ আলোচনা করব।

নিম্নে আইয়ুবের পতনের পর্বটি আলোচনা করা হল।

আইয়ুববিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আইয়ুববিরোধী মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলন তো স্তব্ধ হয়নি, বরং শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণে তা দিন দিন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৪৪ ধারা জারি করে কিংবা সান্ধ্য আইন জারি করে, কিংবা শত শত নেতা-কর্মীকে ধর-পাকড় করেও আন্দোলনকে থামানো সম্ভব হয়নি। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানী নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১ জন স্কুল-শিক্ষক অন্যতম।

আন্দোলন কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পল্লীগ্রামসহ সকল মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে প্রায় ৭৫% সে আহ্বানে সাড়া দেন। পল্লী এলাকার অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিদ্রোহী জনতা হত্যা করে। কয়েকজন বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

Android Coding Bd

অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন (১৮-২-৬৯)। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। অনেক কম্যুনিষ্ট বন্দিকে– যারা দীর্ঘদিন থেকে আটক ছিলেন– তাদেরকেও মুক্তি দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভে ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। উক্ত সময় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় শেখ সাহেবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উক্ত সভাতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানের উদ্ভব ঘটে। সভায় 'বঙ্গবন্ধু' ছয় দফা ও এগারো দফা দাবি অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। এ অবস্থায় আপস-মীমাংসার জন্য আইয়ুব খান বিরোধী ডাক (DAC) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভাসানী ন্যাপ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি উক্ত বৈঠক বয়কট করে। এমনকি শেখ মুজিবকে উক্ত বৈঠকে যোগদান না করার জন্য মওলানা ভাসানী তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি আলোচনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপন করেন। জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদী এবং এবং নেজামে এছলামীর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বঙ্গবন্ধুকে উক্ত দাবিসমূহ উপস্থাপনে বিরোধিতা করেন। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবলমাত্র মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এবং স্বতন্ত্র সদস্য বিচারপতি এস এম মুরশেদ বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান (পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি)-ও পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সমর্থন করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কেবলমাত্র ২টি বিষয়ে সম্মতি প্রকাশের মাধ্যমে ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হয়। আইয়ুব খান যে দুটি বিষয় মেনে নেন তা হল (১) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং (২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান। আওয়ামী লীগ ও মোজাফফর ন্যাপ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দল এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী এতে খুশি হতে পারে না। আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে মন্তব্য করেন। জামাতে ইসলামী গোলটেবিল বৈঠককে 'সফল' বলে অভিহিত করে। হামিদুল হক চৌধুরী একে 'জনমতের বিজয়' বলে মন্তব্য করেন।

Android Coding Bd

মওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান না করলেও বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে নেন। মোজাফফর ন্যাপও তাঁকে অনুসরণ করে। ফলে ১৪ মার্চ DAC ভেঙে যায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ ও মোজাফফর ন্যাপকে অভিনন্দিত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের যে-সকল দল ছয় দফা ও এগারো দফার বিরোধিতা করেছে তাদেরকে নিন্দা করে।

ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় পক্ষান্তরে জামাতের নেতৃত্বে 'ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং তারা ৬ দফা ও ১১ দফা বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করে। এইভাবে বিরোধী জোটের মধ্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা ছয়দফা ও এগারো দফার পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, অপর ধারা গোলটেবিল বৈঠকে অর্জিত ফসল নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। তারা বড়জোর ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল।

ইতোমধ্যে ২১ মার্চ (১৯৬৯) শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার আলোকে পাকিস্তান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সমীপে পেশ করেন। সংবিধানে সংশোধনীর এই খসড়া পেয়ে আইয়ুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ উক্ত খসড়া নীতি পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর অঞ্চলগুলির ব্যাপক সমর্থনের ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে ৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং উক্ত দাবির সমর্থনে ব্যাপক ছাত্র-শ্রমিক গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন আর কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব তার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেয়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করাকে শ্রেয় মনে করলেন এবং সে অনুসারে তিনি ২৪ মার্চ ১৯৬৯ তৎকালীন পাকসেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে এক চিঠি লিখে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। ফলে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এইভাবে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্র জনতার আন্দোলন এক হয়ে আইয়ুব খানের শাসনামলের পতন ঘটালেও শাসনক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অর্পণের, কিংবা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গ্রুপ কিছুতেই ছয় দফার বাস্তবায়ন চাননি। ফলে আইয়ুবের পতন ঘটলেও তাদের স্বার্থরক্ষার্থেই দেশে সামরিক শাসনের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত

Android Coding Bd

প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেয়া হয়।

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০১৩।

Android Coding Bd